Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.130

ভগীরথ মিশ্রের ছোটোগল্পে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন

ড. ইন্দ্রানি হাজরা, *সহকারী অধ্যাপক, হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.09.2026; Accepted: 11.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rural and Urban Life in Bhagirath Mishra's Short Stories Among the fiction writers who emerged in the late 1970s, Bhagirath Mishra stands out for his lasting contributions to Bengali literature, drawing deeply upon a rich tapestry of lived experience. Although the self-absorption and alienation of urban life feature in several works, the vast majority of his stories— roughly three-quarters by his own account— remain rooted in rural reality. Focusing on nineteen selections from 'Bhagirath Mishrer Sreshtha Galpa' (Dey's Publishing), this paper explores how rural and urban life unfold in multifaceted dimensions across his fiction.

Published between the 1970s and 1990s, more than half of these stories depict the marginalized communities of Bankura and Purulia, capturing their indigenous dialects, folk culture, and traditional beliefs. Beneath their apparent simplicity, Mishra uncovers pervasive poverty, latent unrest, emotional complexity, and an underlying spirit of resistance. Concurrently, he lays bare the hollow artificiality of affluent urban society. By contrasting these divergent class perspectives, Mishra creates a compelling artistic portrait that holds an enduring place in modern Bengali short fiction.

Keywords: Bhagirath Mishra, Short Story, Society, Rural Life, Urban Life.

সত্তরের দশকের শেষার্ধে আবির্ভূত যে কথাশিল্পীরা বাংলা কথাসাহিত্যকে বিগত কয়েক দশক ধরে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলেছেন, ভগীরথ মিশ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চাকরিসূত্রে বালুরঘাটে থাকাকালীন 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় 'কদমডালির সাধু' (১৯৭৮) গল্পের মাধ্যমে বাঙালি পাঠককুলের কাছে আত্মপ্রকাশের পরেই 'বর্তিকা', 'প্রমা', 'অনুষ্টুপ' সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। বদলির সূত্রে পরবর্তী কয়েক বছরে বাঁকুড়া জেলাকে কেন্দ্র করে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণ। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প' (১৯৮৩) এবং প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলস্রোত' (১৯৯০) প্রকাশ। দুশোর বেশি ছোটোগল্প, বেশ কিছু বিখ্যাত উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা – বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রকে বর্তমানে নিজ লেখনীর মাধ্যমে ক্রমাগত পরিপুষ্টি দান করে চলেছেন এই খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক।

লেখকের সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি, মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামে জঙ্গল প্রকৃতি ও সরল আদিবাসী মানুষগুলির সান্নিধ্যে শৈশব অতিবাহিত করা মানুষটির জীবন কত বিচিত্র বিধিবদ্ধহীন অভিজ্ঞতায় ভরা। পেশাদার দলে যাত্রা, মাছের ব্যবসা, ওঝা-গুণীন-সাপুড়ের সাগরেদি, ম্যাজিশিয়ানের সঙ্গে গৃহত্যাগ, চাকরি করাকালীন যাদুবিদ্যা শেখা ও দেশ-বিদেশে ম্যাজিক শো দেখানো আর চাকরিসূত্রে জীবনভ'র গ্রামবাংলার

জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা- এই বহুবর্ণময় অভিজ্ঞতা লেখক হিসেবে তাঁর দৃষ্টিকে কীভাবে প্রসারিত করেছে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। কৃত্রিমতার মোড়কে আবৃত নাগরিক জীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর অনেক গল্পের বিষয় হলেও, মূলত তাঁর অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রামীণ জীবনেই বিধৃত। লেখকের মতে তাঁর বারোআনা গল্পেরই পটভূমি গ্রাম।

> "আমার বুকের মধ্যে গ্রাম-প্রকৃতি এবং গ্রামবাসী মানুষজনই জমাট বেঁধে রয়েছেন আজীবনকাল। সেই সুবাদে, আমি তো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, গোটা ভারতবর্ষটাই একটা বিশাল গ্রাম। একটা বিশাল কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক গ্রামই। এমনকি, তার শহর-নগরগুলোও ওই বিশাল গ্রামেরই সম্প্রসারিত রূপ।"[১]

তাই শহরগুলির একটু তলায় ঘুরে দেখলেই দেখা যাবে, সেখানে বয়ে চলেছে যাবতীয় সংস্কার-কুসংস্কারের ধারা। বাঁকুড়া মেদিনীপুর পুরুলিয়া রাঢ়বঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনের রোজনামচার পাশে মাঝে মাঝেই তাই তাঁর গল্পের কাহিনিতে ঘুরেফিরে আসে নাগরিক জীবনের মিশ্র সংস্কৃতি। বাইরের চাকচিক্যের অন্তরালে শায়িত মানুষের অন্তরের নিঃসঙ্গতাবোধ। 'ভগীরথ মিশ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' (দে'জ) সংকলনের উনিশটি গল্প অবলম্বন করে গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন কীভাবে এই গল্পকারের কলমে বহুমাত্রিক বিন্যাসে রূপায়িত হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাই আমাদের আলোচ্য।

সত্তরের দশকের অধিকাংশ সমাজসচেতন কথাকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হন। তাই সত্তর ও আশির দশকের অনেক গল্পে গ্রামের প্রান্তিক শ্রেণির শোষিত মানুষজন তাঁদের সমস্যা জর্জরিত বুভুক্ষু জীবনের রোজনামচা নিয়ে জীবন্তভাবে উঠে আসেন। মহাশ্বেতা দেবীর পথ ধরেই অভিজিৎ সেন, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুবিমল মিশ্র, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, আফসার আমেদ, নবারুণ ভট্টাচার্য, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিল ঘড়াই, সৈকত রক্ষিত, কিন্নর রায়, বীরেন শাসমল, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেক বলিষ্ঠ গল্পকারদের লেখায় গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের অভাব-বঞ্চনা-শোষণ ও বৈষম্যের ছবি বাস্তবোচিতভাবে চিত্রিত হতে থাকে। এঁদের লেখা গল্পগুলিতে পাঠকের অবসর বিনোদন বা মনোরঞ্জনের প্রয়াস নয়, গভীর জীবনসত্যকে তুলে ধরার তাগিদ লক্ষ করা যায়।

> "সত্তরের দশকের সূচনায় কথাকারদের রচনায় যে রূপান্তরিত গল্পভাবনার দেখা মিলল তার উৎস সেই তছনছ হয়ে যাওয়া এলিট শ্রেণির অন্তর্জগৎ। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন দেখা দিল দ্রোহভাব, সাহিত্যিক আকল্পেও এই দ্রোহাত্মক মনোভাব থেকে প্রত্যাখ্যাত ও দূরীকৃত 'অপর জনসমাজ' সম্পর্কে এবার দেখা দিল আগ্রহ আর আর্তি।"[২]

সময়ের ধাক্কাতেই এই সময় পর্বের গল্পবীক্ষা ও গল্পভাবনায় এল বড়ো পরিবর্তন।

> "সত্তরের অসমাপ্ত বিপ্লব এবং তার ভ্রান্তি শোষণমুক্তির স্বর্গ গড়তে না পারলেও অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাত্য গ্রামজীবনকে নাগরিক বর্গের দীর্ঘদিনের প্রত্যাখ্যান আর উদাসীনতার নির্বাসন-মেরু থেকে বের করে এনেছিল।"[৩]

তাই এই সময়পর্বের গল্পগুলিতে গ্রামের দারিদ্র্যদীর্ণ সমাজ, প্রকট শ্রেণি-বিভাজন, জোতদার-ভাতুয়াদের সম্পর্ক, প্রশাসনিক স্তরের দুর্নীতি, সামাজিক অনাচার, জীবন-সংগ্রামে ধ্বস্ত মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব – গ্রামীণ জীবনের নানাবিধ দিক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মিত হতে দেখা যায়।

সময় সচেতন কথাকার ভগীরথ মিশ্রের গল্পেও এর ব্যত্যয় হয় না। সমকালীন সময়ের নানান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে গ্রাম ও নগর জীবনের সূক্ষ্ম ভাষ্য নির্মাণে তাঁর পারদর্শিতা

অতুলনীয়। সত্তর আশি ও নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য গল্প সংকলনের অর্ধেকের বেশি গল্পে বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গ্রাম ও তার অন্তেবাসী মানুষজনেরা কীভাবে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতি-বিশ্বাস-সংস্কার সহ উপস্থিত হয়েছে, তাদের অভাব অভিযোগ বঞ্চনা পীড়নের মর্মন্তুদ চিত্র কীভাবে বর্ণিত হয়েছে কাহিনিগুলিতে, তাই আমরা দেখব। গ্রামের আপাত সরল মানুষগুলির অসহায়তার পাশাপাশি তাদের অন্তর্লীন ক্ষোভ, জটিলতা, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, আদিম প্রবৃত্তি ও বিদ্রোহের চেতনা চরিত্রগুলিতে কীভাবে নানা মাত্রা যোগ করেছে, গল্পগুলির নিবিড় পাঠের মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধানে আমরা ব্রতী হব। শহুরে উচ্চবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে কিছু গল্পে লেখক কীভাবে তির্যক ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, কোথাও শহর ও গ্রামের দুটি পৃথক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্যকে কীভাবে সংহত শিল্পরূপ দান করেছেন, কীভাবে এই পর্বের বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় আলোচ্য গল্পগুলি লেখকের অনবদ্য সংযোজন হয়ে উঠেছে, তাই মুখ্যত আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

সত্তর দশকের পরবর্তী সময়পর্বের গল্পভাবনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লেখক বলেন, একদিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যেমন তিনি গল্পের বিষয় নির্বাচন করেছেন, অন্যদিকে বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন সদর্থক প্রগতিশীল বোধ, মুক্তচিন্তা ও সদাজাগ্রত সমাজচেতনা দিয়ে। কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ বা তত্ত্বের ফ্রেমে কাহিনিকে আটকে ফেলেননি তিনি।

> "তার বদলে আমার ওই সময়ের রচনাগুলিতে ঘটলো সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা ব্যক্তি-মানুষ ও সামাজিক-রাজনৈতিক মানুষের সমগ্র জীবনচর্যার বিবরণ ও বিশ্লেষণ। শুরু হলো মানুষ ও সমাজকে সম্পূর্ণভাবে ধরবার প্রয়াস।"[৪]

ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানুষের সামগ্রিক যাপন সম্পর্কে স্বতন্ত্র এক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর এই সময়ের গল্পগুলির মূল শক্তি। লেখকের শৈশব-যৌবনের গ্রাম্য জীবনের স্মৃতি আর সত্তরের রাজনৈতিক ও সামাজিক বীক্ষার নিদর্শন হল এই পর্বের আলোচ্য গল্পগুলি।

গ্রামের প্রেক্ষাপটে লেখা 'কদমডালির সাধু', 'রাবণ', 'আত্মপীড়ন', 'সুবচনী', 'বিষকপ্পুর', 'ঝোরবন্দী', 'সে ফেরেনি'- প্রায় সবকটি গল্পেই অভাব অনাহার ও জমিদার-জোতদারের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক শোষণের ছবি বারবার ফিরে এসেছে। কদমডালির কুখ্যাত চোর সাধুচরণ নব্বই বছর বয়সে দুদিনের উপবাসে কাতর হয়ে, প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করে নৃশংস চাতুর্যে যে চালগুলি ছিনিয়ে আনে, উপোসী পেটে আম সেদ্ধ দিয়ে সেই চাল ফুটিয়ে খেয়েই তার মৃত্যু হয়। 'রাবণ' গল্পে জিরাবাইদ স্কুলের এক নম্বর পড়ুয়া রাবণ মাঝির পুরো পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে যায় জমিদার সতীকান্ত সিংহবাবুর নির্মম অত্যাচারে। যে জমিটির ধানে তাদের ছয়জনের পরিবারটির আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান হতো, সিংহবাবু তীব্র প্রতিহিংসা বশত সেই ধান নষ্ট করে দেওয়ার ধাক্কায় বাবা মারা যান। এক কাঁসি পান্তা ভাতের লোভে সাত-আট বছরের ছোটো ভাইটি উঁচু গাছের ডাল থেকে পা ফসকে মাটিতে পড়ে মারা যায় আর পেটের জ্বালায় নানা হাত ঘুরে সিংহবাবুর লালসার শিকার দিদিটিরও রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। রাবণ মাঝি উপবাস ভুলতে শক্তি চঁদের কাছে পেটভাতুয়ায় বাঁধা পড়ে থাকে। 'বিষকপ্পুর' গল্পে বিডিও সাহেবের অফিসে সাহায্যপ্রার্থী অনাথা বিধবা রুগ্না বাসনার অর্ধনগ্ন শরীর ও জীর্ণ শিশুটিকে বাঁচানোর কাতর আকুতি যেন গ্রাম ভারতের দুর্ভিক্ষের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়। 'সে ফেরেনি' গল্পে অনাহারী জটার বউ উনুনে জল চড়িয়ে ভাত ফোটানোর ছল করে শিশু সন্তানটির ক্ষুধার জ্বালা ভোলাতে থাকে। সমালোচকের মতে,

> "ভগীরথ মিশ্র বাস্তবের নিষ্ঠুরতা বর্জন করেন না। তাঁর গল্পে মানুষের ক্ষুধা যেন আলাদা একটা চরিত্র। নিরন্তর মার খেয়ে এবং প্রায় না খেয়ে ভারতের মানুষ কীভাবে বেঁচে থাকে – তারই চলচ্চিত্র পাঠককে টেনে রাখে তাঁর গল্পে।"[৫]

সীমাহীন এই অভাবের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষের নিত্যদিনের জীবন সংগ্রাম চিত্রনের ফাঁকে ফাঁকেই লেখক এর পিছনের কারণগুলি চিনিয়ে দিতে বিস্মৃত হন না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সামাজিক শোষণ দুর্নীতি– সবকটি কারণের দিকেই তিনি গল্পগুলিতে আলোকপাত করেন।

'কদমডালির সাধু' বা 'রাবণ' গল্পে বন্যা অজন্মা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কথা যেমন পাই, তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট কালোবাজারির দিকটিও গোপন রাখা হয় না। রাতের অন্ধকারে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী হাওয়া হয়ে যাওয়ার বর্ণনা ও তির্যক বাক্যবন্ধে সাধুচরণের মামার চুরির সপক্ষে প্রদেয় যুক্তির মধ্যে দিয়ে লেখক দুনিয়াসুদ্ধ চুরির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক শ্রেণির মানুষের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার পিছনে যে আর এক শ্রেণির মানুষের অমানবিক হৃদয়হীনতাই দায়ী, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন, "সারা এলাকা জুড়ে একদল মানুষের সম্পদ বাড়াবার খেলা, আর একদলের বেঁচে থাকার লড়াই।"[৬] খিদের জ্বালায় কিশোর রাবণ এক মগ গুড়ের রস খেয়ে ফেলায় তার মনিব শক্তি চঁদ তাকে শাস্তি স্বরূপ মুখে এক মগ গরম গুড় ঢেলে দেয়। 'ঝোরবন্দী' গল্পে মহাজন অবিনাশ প্রধান অর্ধেক মজুরিতে গগনকে কুয়ো কেটে দিতে একপ্রকার বাধ্য করে, "তোর ধার... তোর বাপের ধার... দুদিন বাদে তোর ছেলের ধার...। ক্যাবল সুদটুকু নিলেও তো পুরা মজুরিটাই যায় রে।"[৭] জীবন ও জীবিকার প্রতি সৎ থাকার মাশুল দিতে হয় গগনকে, গর্ভিনী স্ত্রী ও সন্তানদের ফেলে অন্ধকার পাতালপুরীতে অসহায়ভাবে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে সে। ঘণ্টা দুয়েক পরে তুলে আনা কাদা জলে মাখা গগনের মৃতদেহের বীভৎস নিরাসক্ত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সুখী নিরাপদ জীবনের উষ্ণতায় অভ্যস্ত পাঠকের দিকে শাণিত ও অনুচ্চারিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন গল্পকার। 'সে ফেরেনি' গল্পে গ্রাম্য-রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচন করেন লেখক দু-একটি ইঙ্গিতে। কীভাবে সমাজের বোকা সরল প্রান্তিক মানুষ সেই নোংরা রাজনীতির শিকার হয় ও জীবনযুদ্ধে ধ্বস্ত হতে হতে হারিয়ে ফেলে তার সততারূপ মূলধনটুকু, তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন লেখক।

পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের অধীনস্থ অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদের উপর হয়ে চলা দ্বিবিধ শোষণ ও তাদের ভয়াবহ পরিণতির ছবি চিত্রিত হয় বেশ কিছু গল্পে। 'রাবণ', 'দৃষ্টি', 'বিষকপ্পুর' বা 'পুত্রেষ্টি' গল্পগুলিতে নারী ঘরে ও বাইরে কীভাবে ভয়াবহ অত্যাচারে পীড়িত হয় তার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলেন লেখক। রাবণের দিদি যেভাবে সতীকান্ত সিংহের আগ্রাসী লোভের বলি হয়, একইভাবে রাবণ মাঝির রাতজাগুয়া প্রহরাজ বেজের যুবতী স্ত্রীও শিকার হয় রাবণ মাঝির উদগ্র কামনার। সেই কামনার আগুনে দগ্ধ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রাবণ মাঝি শিকার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রহরাজ বেজকে। 'রাবণ' গল্পটি

> "আসলে গ্রামীণ exploitation এবং নারী লোলুপতার গল্প।"[৮]

'দৃষ্টি' গল্পে লৈতনের স্বামী ঝড়েশ্বর লুহার মিথ্যে সন্দেহে বাক্যবাণে নিষ্পেষিত করে লৈতনকে, একমাত্র সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে দিবারাত্রি কদর্য অশ্লীল ইঙ্গিতে। শুধু তাই নয়, নিজের নেশার খরচ জোটাতে স্বামীত্বের অধিকার ফলিয়ে চরিত্রহীন গৌর মণ্ডলের কাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে লৈতনকে জোর করে একলা পাঠাতে চায়।

'বিষকপ্পুর' গল্পে বাসনার লম্পট স্বামী রঘু দাস বাসনা ও তার সন্তানের দায়িত্ব এড়িয়ে বাসনার নাবালিকা বোন অসহায় করুণাকে গর্ভবতী করে। 'পুত্রেষ্টি' গল্পে ভাগ্নে বউ পার্বতীর সন্তানহীনতার দুঃখ ভোলাতে তাকে নানা অছিলায় ভোগ করতে চায় প্রহ্লাদের মামা কংস তুঙ। নেশাগ্রস্ত স্বামীর মনোকষ্ট ও কংস তুঙের লালসা থেকে নিজেকে বাঁচাতে নিরাপত্তাহীনতার যন্ত্রণায় ভোগে পার্বতী। 'আত্মপীড়ন' গল্পে মাগুরিয়া গ্রামের সম্পন্ন

গৃহস্থ নারী লোলুপ দ্বারিক ঘোষের গোয়াল-কাড়নী বিধবা ভুটি বৈধব্যের বছর তিনেক পরে দ্বারিক ঘোষের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয় ও তার ছেলে চুহাকে আজীবন সেই কদর্য সত্যের জ্বালা বহন করে বেড়াতে হয়। এইভাবে গল্পগুলিতে প্রান্তিক শ্রেণির নারীকে কখনও পরিবারে স্বামী বা নিকটাত্মীয়ের দ্বারা, কখনও বিত্তে উচ্চতর অবস্থানে থাকা পুরুষের দ্বারা কীভাবে যৌন হেনস্থা ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়, তা সমাজ সচেতন শিল্পী কাহিনিগুলির মাধ্যমে অতীব বাস্তবোচিতভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের এই ভয়াবহতা তথাকথিত অনগ্রসর মানুষগুলির দৃষ্টিকোণ দিয়েই উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন গল্পকার।

বিত্তবান শ্রেণি কর্তৃক নিম্নবিত্তের উপর হয়ে চলা নিরন্তর শোষণে আত্মরক্ষা বা নিছকই জীবনধারণের জন্য মানুষ যে অনেক সময় অনেক বিচিত্র জীবিকার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তা দেখা যায় কয়েকটি গল্পে। কদমডালির সাধুচরণের মতো সিঁধেল চোরদের বৃত্তি গ্রামে গঞ্জে নতুন না হলেও চৌর্যবৃত্তির অন্তর্গুঢ় কারণটির পিছনে থাকা সামাজিক বৈষম্যের দিকে আলোকপাত করেন লেখক। অন্যদিকে 'ঝোরবন্দী'-র গগন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে কুয়ো খননের কাজ শিখে তাকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে ও দীর্ঘ সময় কেউ তাকে উদ্ধার করতে না আসায় কুয়োর মধ্যেই প্রাণ হারায়। 'ইন্দর যাগ' গল্পে লখীন্দর ওঝা ভৈরব গাঙ্গুলি ও তার পরিবারের লোভের গ্রাস থেকে তার বিদ্যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয়হীন হয়।

তবে অভিনব এক জীবিকার সন্ধান দেন লেখক 'সুবচনী' গল্পের মধ্যে। সেখানে দেখা যায় বাউরি পাড়ায় মেয়ে বউদের শখের গালিগালাজ দেওয়া তথা কুবচনকে সুবচনী বাউরি পেটের দায়ে একসময় জীবিকা হিসেবে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হয়। নেতা মিহির দত্তর স্বার্থসাধনের হাতিয়ার হিসেবে একপ্রকার ব্যবহৃত হয় সুবচনী। তাকে নামমাত্র টাকা দিয়ে সমাজের বিত্তবান শ্রেণি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলে। কেবল অভাবের তাড়নায় ও যোগ্য পরিবেশের অভাবে অসাধারণ এক প্রতিভার অপমৃত্যু হয় ও তা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। যে সমাজ আপন স্বার্থ সাধনে দর কষে সুবচনীর কণ্ঠ ভাড়া করতো, ক্যান্সার হয়ে বৃদ্ধা সুবচনীর কণ্ঠরোধ হয়ে গেলে সেই সমাজের একজন মানুষকেও তার পাশটিতে আর পাওয়া যায় না। দীর্ঘ জীবন কুবাক্য আউড়ে অতিবাহিত করে, অপরাধবোধের ভারে ন্যুব্জ, রুদ্ধকণ্ঠ সুবচনী বাউরি, শেষ বেলায় চোখের জলে ভেসে, মনে মনে ঈশ্বরলীলার পদ বেঁধে বিস্মিত ও পুলকিত হয়।

গ্রামীণ সমাজের অন্ত্যজ মানুষজনেরা ভগীরথ মিশ্রের গল্পভুবন জুড়ে থাকলেও যেখানে তিনি নাগরিক জীবনের উপর আলো ফেলতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি সেই জীবনযাত্রা বিশ্লেষণেও সমান দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন।

> "তিনি জানেন সম্ভ্রান্ত এবং ব্রাত্য দুটি শ্রেণিই একই সমাজব্যবস্থার অন্তর্বর্তী অংশ। একটি সম্প্রদায় নিয়ে লিখতে গেলে অন্য সম্প্রদায়টি এসেই যায়। গ্রামজীবন নিয়ে নানা ভাবনা প্রকাশের পাশাপাশি তাঁর গল্পে তাই শহরজীবনও যথেষ্ট মাত্রায় দেখা দেয়।"[৯]

আলোচ্য গল্প সংকলনে 'নৌকাবিলাস' ও 'পক্ষীবিলাস' গল্পদুটিতে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা গ্রামীণ মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রতি শহুরে উচ্চবিত্ত বুদ্ধিজীবীর কৃত্রিম রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি চরম ব্যঙ্গে বিদ্ধ হয়েছে। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে, খাদ্য পানীয়ের এলাহি আয়োজনে মেতে যে কবি শিল্পীর দল নৌকায় ভেসে সারাদিনব্যাপী তাত্ত্বিক আলোচনার ভান করেন, বেলাশেষে নদীপাড়ের গ্রাম থেকে বাস্তবিক অর্থে দাঙ্গার খবর ভেসে এলে, নিরাপত্তার ভয়ে নৌকা থেকে উচ্চ কণ্ঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান গেয়ে তাঁরা ক্ষান্ত থাকেন। একই শ্রেণির মানুষ 'পক্ষীবিলাস' গল্পের সুধেন্দু লাহিড়ী, বিত্তহীন মানুষের নিদারুণ মৃত্যু যাঁর শিল্পীসত্তাকে চরিতার্থতা দান করে, সন্তানের মৃতদেহ কোলে মায়ের কান্নায় যিনি অচেনা আদিম রাগিণীর সুর শুনতে পান, নিজের সন্তানের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার আকস্মিক সংবাদে তাঁর 'গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে নিপাট

মেঠো কান্না'-য় যে কোনো রাগিণী ধ্বনিত হয় না, গল্পের শেষ লাইনে তীক্ষ্ণ শ্লেষগর্ভী বাক্যে অসামান্য মুন্সীয়ানায় তা তুলে ধরেন লেখক।

'গরু ঘাস খায়' গল্পেও একই জীবনবাস্তবতার বোধ ও দুটি শ্রেণির পার্থক্য নির্দেশিত হয়। সুকুমার রায়ের 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই'-এর মতোই আত্মগর্বী উন্নাসিক শ্রেণিটির অপদার্থতা ও শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে গল্পের শেষভাগে চোখে আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে দেন গল্পকার। 'দ্বীপগুলি' গল্পে সুদৃশ্য অত্যাধুনিক হাউসিং এস্টেটের আপাত সুচারু সুশৃঙ্খল জীবনের অন্তরালে থাকা মানুষের আত্মকেন্দ্রিক দ্বীপবাসের বিপন্নতাকে প্রতিতুলনার মাধ্যমে নগ্নভাবে তুলে ধরেন লেখক। প্রতিটি গল্পের নামকরণ ও কাহিনি বিন্যাসে তাঁর স্বভাবসুলভ তির্যক ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের অসঙ্গতিগুলিকে পরতে পরতে প্রকাশ করে দেন তিনি, যা গল্পগুলিকে আরও উপভোগ্যতা দান করে। গল্পের শেষ অংশের মোচড়ে সৃষ্টি হয় অবিশ্বাস্য চমক। যে চমককে সমালোচক 'দ্বান্দ্বিক লাফ' বলে চিহ্নিত করেন। "আর এই গুণগুত লাফে গল্পটির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে।"[১০]

'ইন্দর যাগ',' 'পুত্রেষ্টি', 'দৃষ্টি' প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে লেখা গল্পগুলিতে গ্রাম্য সমাজে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকা লোকবিশ্বাস প্রবাদ-প্রবচন ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-মন্ত্রের প্রসঙ্গ যেমন একাধিকবার আসে, তেমনি শহরের তথাকথিত আধুনিক, ঝাঁ চকচকে কেতাদুরস্ত জীবনের অন্তরালে প্রবাহিত বিশ্বাস ও সংস্কারের তীব্রতা প্রকাশিত হয় অনেক গল্পে। 'অভিমন্যু' গল্পটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বহিরঙ্গের পরিবর্তনের নীচে থেকে যাওয়া যে সাবেক গ্রাম ভারতকে লেখক তাঁর লিখনবিশ্ব জুড়ে আবিষ্কার করে চলেন, তারই প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হয় এই গল্পটিতে। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় চেহারায়, বেশবাসে, ফ্যাশনে, চাউনিতে, পদমর্যাদায়, ডিগ্রিতে সমাজের বিত্তবান শ্রেণির মানুষগুলি কীভাবে হঠাৎ দেখা বাবাজির চাতুরালিতে বশীভূত হয়ে নাস্তিক যুবক বৈরাগ্যের যুক্তিবাদিতাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে, সূক্ষ্ম ব্যঙ্গচ্ছলে কাহিনিটির মধ্যে লেখক সেই চিত্র পরিবেশন করেছেন। লেখকের নিজের কথাতেই পাই,

> "যে ভারতে হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতিও পাথরের গণেশ-ঠাকুরকে দুধ খাওয়াতে দৌড়ান। যে-ভারতে বিলেতফেরৎ ডাক্তারবাবুটি সাদা গাউনের পকেটে 'মায়ের' প্রসাদী ফুল নিয়ে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকেন। যে ভারতে এখনো জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে ভোট হয়।"[১১]

সেই ভারতবর্ষের মানুষগুলিকেই লেখক তাঁর কাহিনিতে বাস্তবোচিতভাবে অঙ্কন করেন।

মানুষের সমগ্র জীবনচর্যা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণে পারঙ্গম এই কথাসাহিত্যিকের রচনায় নর-নারীর দাম্পত্য, প্রেম, সম্পর্কের জটিলতা বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়। গ্রাম শহর নির্বিশেষে 'দৃষ্টি', 'পুত্রেষ্টি', 'সে ফেরেনি', 'রাবণ', 'বেড়িয়ে আসা', 'রিং' প্রভৃতি গল্পে নর-নারীর দাম্পত্য জীবনচ্ছবি বর্ণিত হয়েছে। দৈনন্দিন অপ্রাপ্তির অন্তরালে লুক্কায়িত অনুচ্চারিত দাম্পত্য-প্রেম যেমন গল্পরসে মাধুর্য আনে, তেমনি ঈর্ষা ও সন্দেহের বিষবাষ্পে জটিল সম্পর্কের শিথিলতাও সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়। 'বেড়িয়া আসা' গল্পটিতে পৃথক দুটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণির দম্পতির জীবন দেখার ধরনে ভিন্নতাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। দাদাবাবু-বউদিমণির দীঘা ভ্রমণের সূত্রে তাদের ছবির মতো সুন্দর সাজানো বাড়ি পাহাড়া দিতে আসা পরিচারিকা আরতি ও তার স্বামীর দিন তিনেকের যাপন কীভাবে পাহাড়-সমুদ্র ভ্রমণের মতোই মধুর হয়ে ওঠে, দারিদ্র্যজীর্ণ ঝুপড়ির সংসারে অভ্যস্ত জীবনে সামান্য বৈচিত্র্যের আস্বাদ কীভাবে তাদের দাম্পত্যকে উজ্জীবিত করে তোলে, তারই নিটোল চিত্ররূপ এই গল্পটি। তবে তালা বন্ধ বেডরুম, ময়লা বেড-শিট, মাত্র একজনের মতো চাল ডাল রেখে যাওয়া - সামান্য কয়েকটি আঁচড়েই শ্রেণিগত ব্যবধান ও মধ্যবিত্তের মানসিকতার দৈন্যকে দর্পণের মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরেন কথাকার।

একটি চরিত্রকে যখন তার সামগ্রিক রূপ সহ নির্মাণ করতে চান লেখক, তখন তার অন্তঃস্থিত কোমল প্রবৃত্তির পাশাপাশি নিষ্ঠুর দিকটিকেও সমান বিশ্বাসযোগ্যতায় তুলে আনার দায়ও তিনি পালন করেন। 'দৃষ্টি' গল্পে দৃষ্টিহীন কৈলাসের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে গ্রামের অল্পবয়সীরা যেভাবে নির্মম আনন্দে মাতে, তাতে তার প্রাণসংকট হয়ে ওঠে। 'আত্মপীড়ন' গল্পে গুড়ের মহালে চুহার সঙ্গে কর্মরত সঙ্গীরা চুহাকে প্রতিনিয়ত দুঃসহ পীড়নের মধ্যে দিয়ে পৈশাচিক আমোদ উপভোগ করে। নিষ্ঠুর পরিহাস ও রঙ্গপ্রিয়তার মধ্যে যে ভয়াবহ শোষণের মনোভাব সমাজের অন্যতম অঙ্গ, তাকে এইসব কাহিনির মধ্যে সামনে নিয়ে আসেন লেখক। আরও বিশ্লেষণ করে দেখান, এইভাবে অবিরত শোষণ ও নিষ্পেষণের সম্মুখীন হতে হতে নির্দোষ সত্তাটির মনের গহীনে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন কীভাবে প্রকাশের পথ খোঁজে, কখনও কখনও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পথ ধরে ভিন্নরূপে সামাজিক অভিঘাত তৈরি করে। 'আত্মপীড়ন', 'রিং', 'পুত্রেষ্টি', 'ইন্দর যাগ' প্রভৃতি গল্পগুলির শেষে পৌঁছে মার খাওয়া মানুষের অভিনব প্রত্যাঘাতের বিবরণ পাঠককে চমকিত করে। 'রাবণ' গল্পে সরল গ্রাম্য স্কুল পড়ুয়া কিশোর রাবণ মাঝির অন্তরের শয়তান কোন পরিস্থিতিতে জাগ্রত হয় ও তাকে প্রবৃত্তির দাসত্বে জর্জরিত নৃশংস খুনীতে রূপান্তরিত করে, তার এই মনোবিকলনের পিছনে যে সামাজিক শোষণের ভয়াবহতাই অন্যতম প্রধান কারণ, তা বুঝিয়ে দেন লেখক।

ভগীরথ মিশ্রের গল্প আলোচনায় তাঁর যে গুণটির কথা অবশ্য উল্লেখ্য সেটি হল তাঁর মেদহীন সাবলীল বলিষ্ঠ ভাষা। সহজ ভাষায় সুগভীর জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশে তিনি সিদ্ধহস্ত। কোথাও লঘুচালে কৌতুক পরিহাসের প্রকাশ, কোথাও তির্যক ভাষাভঙ্গিমায় সূক্ষ্ম শ্লেষের চাবুকে সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ। আঞ্চলিক হোক বা নাগরিক– ক্ষেত্রবিশেষে সব ধরনের ভাষাতেই তাঁর সমান অধিকার। গ্রামের অন্তেবাসী চরিত্রগুলি যেমন তাদের কথ্য ভাষা, হতাশা, ক্ষোভ, খিস্তি-খেউর নিয়ে তাঁর গল্পে সজীব হয়ে ওঠে, তেমনি নাগরিক মানুষের বাংলা-ইংরাজি মিশ্রিত শব্দবন্ধও চরিত্র উপযোগী স্বাভাবিকতা সহ উপস্থাপিত হয়। নানান শ্রেণির মানুষ ও তার জীবনচর্যার বাস্তব চিত্ররূপ নির্মাণে গল্পভাষা যেন তাঁর অন্যতম আয়ুধ।

> "লেখকের প্রতিবেদন, পরোক্ষ বাচন এবং সংলাপ – ভাষার এই ত্রিমাত্রিক স্তরকে তিনি কিভাবে মেশাবেন এবং ব্যবহার করবেন তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে গল্পে। একজন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো তিনিও জানেন, ভাষাও সামাজিক বৈষম্যের ভাবটিকে কিংবা আধিপত্যবাদী বর্গের শাসনযন্ত্রের ধরনটিকে প্রকাশ করে চলে।"[১২]

তাই তাঁর কাহিনির বয়ানে গল্পভাষা হয়ে ওঠে অন্যতম এক মাধ্যম। পণ্যসাহিত্যের সঙ্গে সৎ সাহিত্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে গল্পকার একজায়গায় বলেন,

> "যে ভাবনাকে ভাষারূপ দিয়ে আমরা সাহিত্য রচনা করছি, আমাদের সেই ভাবজগতটি যেন মনুষ্যোচিত হয়, সেই সাহিত্য পাঠ করে মানুষ যেন তার মনুষ্যত্বের সাধনায় এক কদম এগোতে পারে।"[১৩]

আলোচ্য গল্পগুলিকে গভীরভাবে পাঠ করলে তাঁর এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে পাঠকের মনে এক নিঃসংশয় প্রত্যয় জন্ম নেয়। মনুষ্যত্বের সাধনায় পাঠককে দীক্ষিত করে, জীবন সম্পর্কে তাকে আরও সংবেদী করে তুলতে সক্ষম যে সাহিত্য, বর্তমান সময়ের অন্যতম খ্যাতিমান এই কথাশিল্পীর সৃষ্ট গল্পভুবন যে সেই সৎ সাহিত্যের প্রতিশ্রুতিতে উদ্দীপ্ত, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র:

১. মিশ্র, ভগীরথ। "আমার গল্প-ভাবনা – শেষ আড়াই দশক।" কোরক, শারদ ২০২৫। পৃ. ৩০৬।
২. দাশ, উদয়চাঁদ। ছোটোগল্পের বর্ণালি। দিয়া পাবলিকেশন, ২০২১। পৃ. ২৩৬।
৩. তদেব, পৃ. ২৩৭।
৪. কোরক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮।
৫. চক্রবর্তী, সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়। পুস্তক বিপণি, ২০২১। পৃ. ৮৯।
৬. মিশ্র, ভগীরথ। শ্রেষ্ঠ গল্প। দে'জ, ২০২২। পৃ. ২৫৮।
৭. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৮. পাল, রবিন। ছোটোগল্পের বিন্দুবিশ্ব। পুস্তক বিপণি, ২০১৩। পৃ. ১১৯।
৯. দাশ, উদয়চাঁদ। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।
১০. তদেব, পৃ. ২৪৩।
১১. কোরক, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩০৯।
১২. দাশ, উদয়চাঁদ। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪০।
১৩. মিশ্র, ভগীরথ। "সাহিত্য অপসাহিত্য পণ্যসাহিত্য।" প্রতিধ্বনি the Echo, Vol. II, No. II, অক্টোবর ২০১৩। পৃ. ১১১। www.thecho.in/files/bhagirath-mishra.pdf.